উপজাতীয় সমস্যার আর্থ–রাজনৈতিক গতিধারা

হাসানুজ্জামান চৌধুরী *

একটি দেশের বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর সাধারণ আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের বিশেষ নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আদিবাসী বা উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশে অনুরূপ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বিশের অধিক এবং সেগুলোর মোট জনসংখ্যা এখন দশ লক্ষাধিক। বাংলাদেশের আদমশুমারিতে বিভিন্ন উপজাতির জনসংখ্যার পৃথক পরিসংখ্যান না থাকলেও বিগত শুমারি রিপোর্টে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার (যেখানে দেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর অন্যূন ৫০ শতাংশ বাস করে) ১২টি উপজাতির পৃথক পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে[১]। সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নের দিক থেকে উপজাতি প্রধান এ অঞ্চলের যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংঘাত ও উত্তেজনার পটভূমিতে বর্তমানে তা আরো বহুমাত্রিক তাৎপর্যে স্ফারিত হয়েছে। প্রাক–ঔপনিবেশিক যুগে অন্যান্য আদিবাসী এলাকার মত এ অঞ্চলেও বাইরের 'সভ্য' সমাজের অনুপ্রবেশ বা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের প্রভাব ছিল ন্যূনতম। আদিবাসী এলাকার জনগোষ্ঠীর সাধারণ আনুগত্য নিশ্চিত করার অধিক কিছু রাষ্ট্র তখন দাবী করেনি বললে অত্যুক্তি হয় না। সেই সূত্রে, আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা প্রভাবমুক্ত অবস্থায় বাইরের সংস্কৃতির সাথে সংযোগ ও সংঘাত পরিহার করে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে তাদের নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতির পরিমন্ডলে জীবনযাপন করা সম্ভব হয়েছে।

আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পলাশীর ঘটনার পরে, ইংরেজ কোম্পানীর শাসন শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক কাঠামোতে নূতন পরিবর্তন সূচিত হলে উপজাতীয় এলাকা সমূহেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। কৃষি ও হস্তশিল্পের গ্রথিতবদ্ধ সম্পর্কের ওপর গড়ে ওঠা ভারতের প্রাচীন গ্রামগোষ্ঠী ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে তখন ইংরেজরা তাদের অবাধ লুণ্ঠনের স্বার্থে যে

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সমূহও তার অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। তাদের আদিম অর্থনীতি, গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক বিধি-বিধান, ভূমি ও বনভূমির ওপর প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকার তখন আর অক্ষুন্ন থাকেনি। কিন্তু এর বিরুদ্ধে উপজাতীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্রোহ করতেও দ্বিধা করেনি। বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হলেও ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে উপজাতীয়দের ঐসব বিদ্রোহ ছিল বৃহত্তর সমাজের অন্যান্য শ্রেণী বা গোষ্ঠী সমূহের বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ আন্দোলনেরই সমসাময়িক ঘটনা[২]। কিন্তু উপনিবেশবাদের অবসানের কালে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ভারতীয় উপ-মহাদেশে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে সাধারণভাবে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহ ছিল সে প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারায় ঐ সকল রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটে উপজাতীয়রা ছিল স্বাভাবিকভাবে সে ধারারও বাইরে। তবে নূতন রাষ্ট্রসমূহের সীমারেখা দ্বারা বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠী সমূহের মত উপজাতীয়রাও বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতির মাধ্যমে বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠী সমূহকে শাসন করার কৌশল অবলম্বন করেছিল উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে তার ধরন ছিল ভিন্ন। এক্ষেত্রে মিশনারী কার্যকলাপ ও ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া ছিল তাদের ঔপনিবেশিক কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সর্ব প্রকার বহিঃপ্রভাবকে উপেক্ষা এমনকি প্রতিরোধ করা যদিও যে কোন আদিম জনগোষ্ঠীর সাধারণ প্রতিক্রিয়া হিসাবে লক্ষ্য করা যায় তথাপি এদেশে অনেক উপজাতি মিশনারী কার্যকলাপ ও ধর্মান্তরকে প্রায় অবাধে গ্রহণ করে। এতে তাদের কিছু বৈষয়িক উন্নতি ঘটলেও রাজনৈতিকভাবে তারা হয়ে পড়ে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন এবং নিষ্ক্রিয়[৩]। বস্তুতঃ ঐ কারণে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথমে তারা নিজেরা সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করলেও পরবর্তীকালে ইংরেজ বিরোধী সার্বজনীন আন্দোলনকালে তাদের কোনরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। এর ফলে, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানকালে যখন বৃহত্তর জাতি গোষ্ঠী সমূহের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন আদিবাসী বা উপজাতীয় প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত থেকে যায়। উপনিবেশোত্তরকালে যেমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতে, তেমনি আমলা শাসিত পাকিস্তানে ঐ প্রশ্ন অন্যতম প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিরাজমান থাকে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপ-ঔপনিবেশিক কাঠামো ভেঙ্গে স্বাধীনতা অর্জনের কালে বাংলাদেশও উপজাতীয় সমস্যার উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু স্বকীয় অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের উপর্যুপরি অদূরদর্শিতা ও ব্যর্থতা উপজাতীয় সমস্যাকে পরিণামে এক

জটিল সশস্ত্র সংঘাতের পর্যায়ে উপনীত করেছে। সামগ্রিক পটভূমিতে অবলোকন না করলে এ সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি উপলব্ধি করা কঠিন। ঐ লক্ষ্যে 'শাসনতান্ত্রিক/ প্রশাসনিক', 'অর্থনৈতিক' এবং 'সামরিক' এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমস্যার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে ভূমি হারানো, বন সম্পদ উজাড় হওয়া, পণ্য সংস্কৃতির দুষণ তথা আরণ্যক জীবনের বেপরোয়া ধ্বংসের মুখে উপজাতীয় জনমানুষের সামাজিক বিলুপ্তির যথার্থ নৃতাত্ত্বিক চিত্র ঐসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ফুটে উঠবে না। কিন্তু অনুরূপ বিলুপ্তির মুখে উপজাতীয়দের রাজনৈতিক উত্থান ও প্রতিরোধের প্রকৃতি এবং তাৎপর্য হয়ত কিছুটা অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

'শাসনতান্ত্রিক/প্রশাসনিক' : বাংলাদেশে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে, ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ইংরেজ শাসনের অধীন হয়। ঐ সময় থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলের শাসনকার্য সাময়িক বিধিমালা জারীর মাধ্যমে পরিচালিত হতে দেখা যায়। বহুলাংশে স্বায়ত্বশাসনই ছিল তখন এ অঞ্চলের মূখ্য প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য। কেননা গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধিরূপে একজন ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার ব্যতিরেকে সেখানে পৃথক পুলিশ বাহিনীসহ সকল প্রশাসনিক কর্মচারী নিযুক্ত হত স্থানীয় উপজাতীয়দের মধ্য থেকে। তিন উপজাতীয় প্রধানই (চাকমা, বোহ্মং ও মং) উপজাতীয় ঐতিহ্য অনুসারে রাজস্ব সংগ্রহ থেকে বিচারকার্য অবধি সবকিছু পরিচালনার দায়িত্ব পালন করত। বহিরাগতদের স্থায়ী বসতিস্থাপন ছিল প্রায় নিষিদ্ধ, কেননা তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া ছিল অত্যন্ত দুরূহ। ১৯০০ সালের রেগুলেশনের অধীনে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল ইত্যাকার আঞ্চলিক বিধিসমূহকে অক্ষুন্ন রাখে। ১৯৩৫ সালের 'ভারত সরকার আইনে'ও এ অঞ্চলকে 'সম্পূর্ণ বহির্ভূত এলাকা' ("totally excluded area") হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ঐ সূত্রে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় স্থানীয় উপজাতীয় প্রধানগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'স্থানীয় রাষ্ট্র' ("native state") হিসাবে স্বীকৃতি দানের অথবা অন্যথায় একে উত্তর পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে 'মৈত্রীবন্ধ' ('Confederate') করার দাবী উত্থাপন করে। কিন্তু কার্যতঃ তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসাবেই তার ভৌগোলিক–রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালেই 'চিটাগাং হিল্‌ট্রাক্টস্ ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন ১৮৮৯' বাতিল করে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর স্থলে এই এলাকাকে পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ প্রশাসনের অধীনে ন্যস্ত করে।

আবার স্বল্পস্থায়ী ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র এবং সামরিক অভ্যুত্থান পরবর্তী ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের ''বহির্ভূত এলাকাগত'' মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হলেও ১৯৬৩ সালের এক সংশোধনীর মাধ্যমে (১৯৬৪ সালে কার্যকর) এ এলাকার স্বতন্ত্র উপজাতীয় মর্যাদা বাতিল করা হয়। সেভাবে ১০ই জানুয়ারী, ১৯৬৪ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের সাধারণ একটি এলাকায় পর্যবসিত হয়। বস্তুতঃ এ পদক্ষেপ 'কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর্যায়েই গৃহীত হয়'[৪]। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রণীত ১৯৭২ সালের সংবিধানেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার স্বতন্ত্র এলাকাগত কোন বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করা হয়নি। বস্তুতঃ সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদ–৩য় অংশে 'গতিবিধির স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে ব্যক্ত করা হয় যে 'জনস্বার্থে আইন বলে যে কোন যুক্তিযুক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ সাপেক্ষে, প্রতিটি নাগরিকের বাংলাদেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, যে কোন স্থানে বাস ও বসতি স্থাপন করা এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেখানে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার থাকবে'[৫]। সাধারণ বাঙালীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক চাপের পটভূমিতে এরূপ সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছিল জাতীয় অবস্থার অবনতি রোধে একটি বড় পদক্ষেপ। এতে জনবিরল এই পার্বত্য এলাকায় বিপুল সংখ্যক বহিরাগত বাঙ্গালীর বসবাসের সুযোগ করা হয়। আর ঐ সুযোগে সেখানে যে ব্যাপক বহিরাগত সমাবেশ ঘটে তাতে উপজাতীয়দের স্বাভাবিক অর্থনীতি, সমাজ কাঠামো ও সংস্কৃতি ব্যাপক হুমকির সম্মুখীন হয়। এ পটভূমিতে উপজাতীয়দের নিজেদের স্বায়ত্বশাসনের দাবী আর সেগুলোর প্রতি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মনোভাবের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান ক্রমান্বয়ে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যা আজ জাতীয় সংহতির প্রতিও হুমকি হয়ে উঠেছে।

'অর্থনৈতিক' : ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে উপজাতীয়দের সম্পর্ক ছিল মূলতঃ রাজস্বভিত্তিক। উপজাতীয় রাজা বা প্রধানগণ যে ঐতিহ্যানুগ নিয়মে ঐ রাজস্ব আদায় করত তাতে উৎপীড়ণমূলক কোন আচরণের অবকাশ প্রায় ছিল না বললেই চলে। তবে বৈধ ছাড়পত্র নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত বাঙ্গালী মহাজনরা যখন তৎকালীন তালুকী ব্যবস্থার অধীনে নীলামে তালুক ক্রয় এবং সে সুবাদে হেড্‌ম্যান, দেওয়ান ইত্যাদি পদ দখলের সুযোগ নিতে শুরু করে তখন উপজাতীয়রা শোষণমূলক রাজস্ব সম্পর্কের সম্মুখীন হয়। কিন্তু চাকমা উপজাতীয়দের প্রবল বিরোধিতার মুখে ১৮৭৩ সালেই এর নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এ সময় যে আইন করা হয় তাতে ঐসব পদের নিযুক্তি 'ঝুমিয়া' তথা উপজাতীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়[৬]। পরবর্তীতে ১৯০০ সালের রেগুলেশনে ঐ তালুক

ও দেওয়ানী প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা হয়[৭]। উপজাতীয়দের দাবীর প্রতি এরূপ নমনীয় আচরণকে নিছক প্রশাসনিক বিবেচনা প্রসূত ঘটনা বললে যথার্থ বলা হয়না। পরন্তু ঔপনিবেশিক শাসকদের এক ব্যতিক্রমধর্মী উদারতা ও কল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গীও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে[৮]। তবে একথাও সত্য যে যেখানে বিপুল বৃহত্তর সমতল ভূমি ও তার অ–উপজাতীয় জনগণকে শোষণের সুযোগ ছিল এক কথায় সীমাহীন সেখানে একটি দুর্গম জেলার আদিবাসীদের প্রতি একটু ব্যতিক্রমী উদারতা প্রদর্শন করা শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে আদৌ কোন অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। পরন্তু তাদের ব্যবহারিক বিভেদ নীতির নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে যে ঐরকম কিছু না করাই হত অস্বাভাবিক। পক্ষান্তরে উপনিবেশোত্তর কালে দেশীয় শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে উপজাতীয় এলাকার সম্পদকে উপজাতীয় জনগণের চেয়ে খাট করে দেখাও ছিল অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক তাগিদ থেকেই সেখানকার সম্পদকে তখন আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার আওতাধীন করার উদ্যোগ গৃহীত হয় এবং সেভাবে কাগজের কল, জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের মত বড় শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এসব শিল্প উদ্যোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এগুলো প্রায় সম্পূর্ণভাবে অ–উপজাতীয় শ্রম শক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। আর, ঐভাবে উপজাতীয়দেরকে তাদের প্রাকৃতিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল রাখা হলেও সে অর্থনীতি আবার শিল্প স্থাপনার কারণেই বিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে শিল্প স্থাপনার ফলে তাদের স্বাভাবিক অর্থনীতি যতটা বিঘ্নিত হয় সম্ভবতঃ তার চেয়ে সেটি অধিকতর বিঘ্নিত হয় বর্ধিত হারে ফড়িয়া, বণিক, ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশের ফলে। এভাবে, উপজাতীয় এলাকায় স্থাপিত শিল্প কারখানার বহিরাগত শ্রমিক কর্মচারীদের পাশাপাশি বহিরাগত বণিক ব্যবসায়ীদেরও অবাধ সমাবেশ ঘটে। এতে উপজাতীয় এলাকার অর্থনৈতিক, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক সংযুক্তির ঐতিহ্যগত স্থিতি ব্যাপক ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশের আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সর্বাধিক বিপর্যয়কর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি[৯]। প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জনগোষ্ঠী এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর এক বড় অংশ বিপর্যয় এড়ানোর জন্য পার্শ্ববর্তী ভারতীয় রাজ্যসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদেরকে পূর্ণবাসনের কর্মসূচী হিসাবে যাই গ্রহণ করা হোক অথবা, পুনর্বাসন কাজ বাস্তবে যতটুকুই সম্পন্ন করা হোক, যেমন এ প্রকল্প তেমিন অন্যান্য শিল্প প্রকল্পের মধ্যে উপজাতীয়দের অন্তর্ভূক্ত করার কোন কর্মসূচী

কখনো লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে উপজাতীয় জীবনে অনুরূপ আধুনিকতার অনুপ্রবেশ কেবল নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারেরই সহায়ক হয়েছে। অন্য কথায়, আধুনিক অর্থনৈতিক উদ্যোগ সমূহ উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক অভিযোজন ও বিকাশের সম্ভাবনাকে যতটা না প্রসারিত করেছে তার চেয়ে বৃহত্তর জাতীয় সংস্কৃতির সাথে তাদের সংঘাতের পথকে অনেক বেশী প্রশস্ত করেছে।

'সামরিক' : পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সাথে বহিরাগত শাসকদের সম্পর্ক শুরুতে বরাবরই বৈরিতাগ্রস্ত ও সংঘাতমুখী ছিল। বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক যুগে ১৭৭৭ থেকে ১৮৮৯ সালের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কুকী, সেন্দু,হাউলা (লুসাই) প্রভৃতি উপজাতীয়রা বহুবার সহিংস বিদ্রোহ করেছে। ১৮৯৮ সালের পরেই কেবল অনুরূপ সংঘর্ষ স্তিমিত হয়ে আসে[১০]। বস্তুতঃ ১৯০০ সালের রেগুলেশনের অধীনে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যনুয়েলে উপজাতীয়দের যে স্বতন্ত্র আর্থ–সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক মর্যাদা দেয়া হয় তাতেই দীর্ঘদিন উপজাতীয় এলাকার সার্বিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ঐ স্বতন্ত্র মর্যাদা বিলোপ করার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র তাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ পটভূমিতেই উদ্ভব হয় উপনিবেশোত্তরকালের সামরিক অভিযান ও সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার। বস্তুতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে মুক্তিবাহিনীর এক অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগীদের বিরুদ্ধে যে উৎপীড়নমূলক অভিযান পরিচালিত করে সে সূত্রেই ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে উপজাতীয়দের প্রতিরোধ সংগঠন হিসেবে 'জন সংহতি সমিতি'র উন্মেষ ঘটে[১১]। জন সংহতি সমিতির সভাপতি এম, এন, লারমা এবং বাংলাদেশ সরকারের উপজাতীয় বিষয়ক উপদেষ্টা রাজা মং প্রু চৌধুরী পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য ৪–দফা দাবী নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করেন[১২]। একাধিকবার ঐ নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করলেও দাবীগুলোর প্রতি সরকার পক্ষ থেকে কোনরূপ ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গী দেখানো হয়নি। মধ্য পচাঁত্তরের সামরিক অভ্যুত্থান পরবর্তী জেনারেল জিয়ার সরকারও ঐসব দাবীর প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায়নি। পক্ষান্তরে ঐসময় থেকে উপজাতীয় এলাকায় ব্যাপকহারে বাঙ্গালী বহিরাগতদের বসতি স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে সামরিক ও আধা–সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং বহিরাগততের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির সশস্ত্র

সংগঠন শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সংঘাত শুরু হয় যা ক্রমান্বয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী আভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। জীবন ও সম্পত্তির ধ্বংস ছাড়াও এ যুদ্ধ বাংলাদেশের জাতীয় সংহতি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করেছে এবং প্রতিবেশী দেশের সাথে তার সম্পর্কের অবনতির কারণ হয়েছে[১৩]। জাতিগত নিপীড়ন ও তার পরিণতির অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও উপজাতীয় প্রশ্নের সঠিক নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সে অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগানোর ফলে এভাবে সমস্যার আন্তর্জাতিকীকরণও করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত অনুপ্রবেশ, সাম্প্রদায়িকতা, সামরিক অভিযান, সশস্ত্র সংঘাত ইত্যাদির পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমকে যদি উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক চেতনা ও পরিচয়ের দাবীকে অর্থনৈতিক পন্থায় নিস্তেজ এবং নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার উদ্যোগ হিসেবে দেখা যায় তবে সে উদ্যোগের সাফল্য এখন প্রশ্ন সাপেক্ষ। সাধারণ উপজাতীয়দের কাছে ঐসব কার্যক্রম যে কোন ধরনের কার্যকর আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি তা শান্তি বাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন কার্যকলাপ, সহিংস ঘটনার বিস্তৃতি, সরকারী উদ্যোগে আলোচনা অনুষ্ঠান, সর্বোপরি, উপজাতীয়দের ব্যাপকভাবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে যথেষ্ট প্রতিফলিত। বস্তুতঃ সরকারী উন্নয়ন ব্যয়ের সিংহভাগ যে সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা পার্বত্য পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্বাহ হয় সেটা কারো অবিদিত না [১৪]। বিপুল সংখ্যক বহিরাগত বসতি স্থাপনকারীদেরকে দেয় সাহায্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন খাতে যে ব্যয় হয় তাতে উপজাতীয় জনগণের আনন্দিত বোধ করার কোন কারণ নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে, অনুরূপ উন্নয়ন কার্যক্রম উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাজাত্যবোধকে আরো দৃঢ়সন্ধ করছে বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে ধারণা করা হয় যে, এ পটভূমিতে কোন চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়া থেকে পরিস্থিতির সংরোধ সম্ভব হয়েছে সরকার কর্তৃক সংহতি সমিতির সাথে আনুষ্ঠানিক সংলাপ অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়ায়। ১৯৮৪ সালের মে মাসে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি এবং ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে সরকারী কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৮৮ সালের জুন অবধি উভয় পক্ষের মধ্যে আরো চারটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির পেশকৃত পাঁচ দফা দাবী এবং ঐসব দাবী পূরণে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংশোধনীর ব্যাপারে কথিত সরকারী অপারগতার কারণে সিদ্ধান্তহীনভাবে ঐ সকল বৈঠক শেষ হয় বলে জানা যায়। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্বশাসনের মত দাবী কেবল কয়েকটি বৈঠকের

মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে অথবা ঐ ব্যাপারে সরকার পক্ষ তার প্রতিপক্ষের সামনে অলংঘনীয় রাষ্ট্রীয় নীতি–আদর্শ–দর্শনের যুক্তি উপস্থিত করবেন এটা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, অনুরূপ দাবী পুরণে সাংবিধানিক সমস্যার যুক্তি মোটেই অকাট্য নয়। বস্তুতঃ সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন থেকে চার রাষ্ট্রীয় মুল নীতির পরিবর্তন সহ ১৯৮৮ সালের মধ্য ভাগে আনীত সংবিধানের ৮ম সংশোধনী প্রমাণ করে যে সরকারী দলের ইচ্ছা সাপেক্ষে সংবিধানের যে কোন প্রকার সংশোধনই সম্ভব। এমনকি সম্ভাব্য কোন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর জন্য সাংবিধানিকভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করে সরকার দলীয় সংসদ গঠনও এখন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। এদিক থেকে জাতীয় সংহতি ও নিরাপত্তার স্বার্থে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্বশাসনের দাবীর প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের জন্যে সংবিধান সংশাধনের বিষয়টি আইনগতভাবে যেমন বাধামুক্ত তেমনি নৈতিকভাবেও অপরিহার্য। একথা সত্য যে জন সংহতি সমিতি তাদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে যুগপৎ নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র পন্থায় সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু এটা খুবই স্পষ্ট যে ঐ সংগ্রাম কোন পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীসংগ্রামনয়[১৫]। পরন্তু এটি বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং তার সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে স্বকীয় সামাজিক–সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসারে এবং নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থায় নির্বিঘ্নে জীবন যাপনের অধিকার আদায়ের একটি সচেতন ও সক্রিয় আন্দোলন মাত্র। বস্তুতঃ যে এলাকায় এ আন্দোলন কেন্দ্রীভূত সেটি ব্যতিক্রমভাবে বাংলাদেশের একাধিক আন্তর্জাতিক সীমানার সংযোগ স্থল। আর ভৌগোলিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটেও লক্ষণীয় যে এশিয়ার এ তিনটি দেশেরই (ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা) সংশ্লিষ্ট সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে দীর্ঘদিন থেকে নানান অস্থিরতা বিরাজমান। বাংলাদেশ যদি তার উপজাতীয় সমস্যাকে রাজনৈতিক–সাংবিধানিক উপায়ে নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে কালক্রমে অনুরূপ নিষ্পত্তির একক ক্ষমতা বাংলাদেশের হাতে নাও থাকতে পারে। কেননা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ব্যাপারে উৎসাহী অনেক শক্তিশালী পক্ষই তাদের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে এ ধরনের পরিস্থিতির সুযোগ নিতে এগিয়ে আসবে। তাই স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তথা সকল বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার আশু রাজনৈতিক সাংবিধানিক নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্জনীয়। অন্য কোন ভাবে এর মোকাবেলার চেষ্টা কেবল নিরর্থকই হবেনা, বাংলাদেশের মত একটি পশ্চাদপদ ছোট দেশের জন্য সেটি বিপত্তিকরও হতে পারে।

তথ্যনির্দেশঃ

১. Percent of households belonging to different tribes in Chittagong H.T., 1981.

Tribes	Total
	100.00
Chakma	48.12
Marma	27.78
Tripura	12.31
Tarchangya	4.01
Mro	4.03
Ushai	0.91
Lushai	0.24
Bawm	1.30
Pankhua	0.52
Chak	0.02
Khiang	0.32
Khumi	0.27

Source : Banlgadesh Bureau of Statistics, Bangladesh Population Census 1981, Dhaka, August 1984, Table 23, P. 138.

২. V.R. Raghavaiah observed that "It may not be correct to suppose that the tribal revolts were unconnected with the general popular discontent resultaing from the ruthless exploitation engineered by the British East India Company's unscrupulous and commercial administration ... (T) rouble was undoubtendly brewing virtually in every part of the country among almost every section of the people .... The revolts of the tribal people were not isolated, on the other hand, shared many features in common with the revolts of nontribal, agrarian and small trading communities." (V.R. Raghavaiah, "Background of Tribal Struggles in India" in A.R.

Desai (Ed), Peasant Struggles in India, Oxford University Press, Bombay, 1982, PP. 17-18)

৩. "One of the main reasons why tribal people in this sub-continent feel disunited, isolated, and thwarted, is the gradual and steady temptation to which they succumbed in the past one hundred years, by allowing themselves to be easily converted by powerful religious. Missions, foreign as well as indigenous, not because they really believed that their pattern of faith was inferior to that of others, but because through conversion they fondly hoped to secure economic betterment, freedom from exploitation and relief from the sowear's or Mahajan's (money lender) hrassment. The earlier Christian missionaries who felt that the tribal areas served as fertile fields for their proselytizing, operations, worked in close cooperation with the administrations, that the impression was inevitably created that redress from wrongs could be secured quicker and more effectively from the Government through the intervention and influence of these intermediaries." (Ibid., PP. 15-16).

৪. See Amnesty International, Unlawful killings and Torture in the Chittagong Hill Tracts, London, 1986, P.4.

৫. Government of Bangladesh. The Constitution of the Peoples' Republic of Bangladesh, Dhaka, 1979, P.14.

৬. Hunter observed that, "The strong conservative feeling of the Chakma people has operated effectually against allowing the headmanship to pass into the hands of the Bengalis. Although the so-called taluk might be bought and sold, the people refused to give allegiance to a Bengali headman and the sale of the office of the headman is no longer held valid by our court. It was ruled by the Government, in 1873, that the headman was to be nominated by the chiefs, and appointed by the Deputy Commissioner and that they must be chosen from among the jumiyas and must not be outsiders" (W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol. VI. D.K. Publishing House. Delhi, 1973, P.91)

৭. "In 1900 the so-called taluk system was abolished by the British Government and the Dewans were replaced by a hierarchy of Chiefs, Headman and Karbaries who were entrusted with the responsibility of settling petty criminal and civil cases, besides their function to collect revenue" (Government of Bangladesh, Bangladesh District Gazetteers--CHTs, Dhaka, 1975, P. 255).

৮. Captain Lewin, the first Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts noted that, "Let us not govern these hills for ourselves, but administer the country for the well-being and happiness of the people dwelling therein . . . what is wanted here in not measure but a man . . . With education open to them, and yet moving under their own laws and customs, they will turn out, not debased and miniature epitoms of Englishmen, but a new noble type of God's creature" (cited in Ibid., P. 257).

৯. The construction of the Karnafuli Multi-purpose Hydel Project and the formation of its reservoir led to the displacement of over 100,000 people i;e. more than one-fourth of the then CHTs population and most of them were Chakma. 'The inundation threw over 54,000 acres of plough land out of cultivation. This area constitutes 40 percent of the total settled cultivable land of the district' (Ibid., P. 42).

১০. Government of Bangladesh, Ibid., PP. 28-32.

১১. চাকমা উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে গঠিত এই সর্বশেষ সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি আদর্শ বা উদ্দেশ্যের দিক থেকে একটি যুদ্ধোত্তর পটভূমিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও চাকমাদের অগ্রসর অংশের সাংগঠনিক চেতনা ও ঐতিহ্য যথেষ্ট পুরানো। এ প্রসঙ্গে চাকমাদের অতীত যেসব সংগঠনের নাম জানা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চাকমা যুব সমিতি' (১৯১৫), 'চাকমা যুব সংঘ' (১৯১৮), 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি' (১৯২০), 'পাহাড়ী ছাত্র সমিতি' (১৯৬৬) ইত্যাদি।

১২. ৪–দফা দাবীগুলো ছিল ঃ '(১) একটি স্বতন্ত্র বিধান সভা সহকারে পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল; (২) জুম্ম জনগণের অধিকার নিশ্চিত করণের জন্য শাসনতন্ত্রে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের অনুরূপ একটি সংবিধির ব্যবস্থা, (৩) উপজাতীয় প্রধানগণের সনাতন প্রশাসনিক দফতর

বহাল রাখা, এবং (৪) শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পূর্ব সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত বিষয়াদির কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন না করার শাসনতান্ত্রিক নিশ্চয়তা'। শ্রী উত্তরণ, "পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিকাশ ও ভবিষ্যৎ", পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি, ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ স্মরণে, ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৮।

১৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বর্ণনা আংশিকভাবে জাতীয় পত্রিকা ও সাময়িকীগুলোতে প্রকাশ করা হলেও জনসংহতি সমিতির প্রচার পুস্তিকাসমূহ, বিদেশী পত্র–পত্রিকা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সমূহ, এমনেষ্টি ইনটারনেশন্যাল ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১৪. জন সংহতি সমিতির এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে "পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা, ১,১৬,০০০ এবং ৩টি সেনানিবাস ও কাপ্তাই সংলগ্ন নৌ–ঘাঁটি সহ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প সংখ্যা ছিল ৫৬টি। পক্ষান্তরে ১৯৮৫ সাল নাগাদ মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৪,৪৭,২০০ এবং ৩টি সেনানিবাস, নৌ–ঘাঁটি সহ সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প ১৮৭ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মাত্র ১২টি থানা ছিল। পরবর্তীতে থানার সংখ্যা বৃদ্ধি করে বর্তমানে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম ২৮টি থানা স্থাপন করা হয়েছে"। (শ্রী রবি, "পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ", জনসংহতি সমিতি, ১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে, ১০ই নভেম্বর ১৯৮৫, পৃঃ৮৫)।

১৫ জন সংহতি সমিতির একটি প্রচার পুস্তিকায় এটি খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে যেঃ "দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের সংহতি, সংস্কৃতি, সামাজিক সংগঠন, ভাষা, প্রথা প্রবাদ তথা জাতীয় অস্তিত্ব বৃহৎ জাতির জাত্যাভিমানের করাল গ্রাসে আজ বিলুপ্তির পথে। অথচ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে জুম্ম জনগণেরও মানুষের মত বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার রয়েছে। জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করছেনা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেই জুম্ম জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্থাৎ আইন পরিষদ সহ প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন পেতে চায়। বস্তুতঃ পাঁচ দফা দাবীনামার সুষ্ঠ বাস্তবায়নের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান নিহিত।" ("পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি ও গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক সমূহের প্রেক্ষাপটে জন সংহতি সমিতির বিবৃতি", পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ২৮শে মার্চ, ১৯৮৮)।